গুপ্তযুগ : সমাজ-জীবন ও অর্থনীতি

সমাজ-জীবন : চতুর্বর্ণ : গুপ্তযুগের লেখমালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উল্লেখ কম, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের উল্লেখ সুপ্রচুর। সন্দেহ নেই, এই পর্বে বৌদ্ধ এবং জৈনদের প্রতিবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে স্বাভাবিক কারণে চতুর্বর্ণ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়, যাগ-যজ্ঞের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করে ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। যাজ্ঞবল্ক্য বেদপাঠ, যজন ও দান উচ্চতর তিন বর্ণের আবশ্যিক কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের বৃত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ প্রধানত অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন। দুর্দিনে ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু অবস্থার উন্নতি হলে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন এবং নিম্নবৃত্তির দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ ত্যাগ করবেন। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ কিন্তু বেদপাঠ না করলে তিনি পতিত হবেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শাসন ও যুদ্ধ হল ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি কিন্তু অবস্থা বিশেষে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবেন। কৃষি, পশুপালন, সুদের কারবার এবং ব্যবসা, বৈশ্যের এই চারটি বৃত্তির কথা বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। মহাভারতের শান্তিপর্বে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের পক্ষে প্রশস্ত বলা হলেও সেখানে পশুপালনের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উচ্চতর তিন বর্ণ, বিশেষত ব্রাহ্মণের সেবা করে শূদ্র জীবিকা নির্বাহ করবেন, এই যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির বিধান। শূদ্রের প্রয়োজনবোধে ব্যবসা ও কারিগরি শিল্প করার অধিকারও সেখানে স্বীকৃত হয়েছে। শান্তিপর্বে শূদ্রের জীবিকারূপে পশুপালনেরও উল্লেখ আছে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় বেদের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণদের ঋগ্‌বেদী, সামবেদী, আথর্বণ ইত্যাদি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা চার বেদে পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের চাতুর্বিদ্য বলা হত। এক বেদে দক্ষ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলা হত। ঠিক সময় উপনয়ন না হলে ব্রাহ্মণ ব্রাত্য বনে যেতেন।

ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার : ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কয়েকটি বিশেষ অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রাজস্বদান থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন বলেছেন, ব্রাহ্মণ গুরুতর অপরাধ করলেও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলবে না, তাঁকে জরিমানা বা বড়জোর নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া যেতে পারে। সমকালীন নাটক মৃচ্ছকটিকেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, বিচারক হত্যার অপরাধে চারুদত্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের জন্য তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেননি।

এ সময় বেদজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণদের অনুকূলে নিষ্কর জমি বা গ্রামদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণরা যাতে তাঁদের ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কার্যকলাপ নিষ্পন্ন করতে পারেন তার জন্যই এই দান। অনাবাদি অথচ চাষযোগ্য, এমন জমিই সাধারণত দান করা হত। ব্রাহ্মণরা সাধারণত নিজের হাতে চাষ করতেন না, ভাগচাষি বা শ্রমিকদের দিয়ে সে কাজ করাতেন। উদার হস্তে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে ভূমিদানের ফলে তাঁদের কেবল আর্থিক সংগতিই বৃদ্ধি পেল না, স্থানীয় অঞ্চলে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ল। সংগতিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল।

Scanned with CamScanner

শূদ্রদের অবস্থার উন্নতি : শূদ্রদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটল এ পর্বে। এই সময় হতে শূদ্ররা ব্যাপকভাবে কারিগরি শিল্পে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। কামন্দকীয় নীতিসার, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণে শিল্পকর্ম শূদ্রদের স্বাভাবিক জীবিকারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। বৃহস্পতি ধাতু, দারু, বস্ত্র, প্রস্তর ও চর্ম শিল্পে শূদ্রদের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। অমরকোষে শূদ্রবর্গে বীণাবাদক, বাঁশিবাদক, বাজনাদার, নট ও নৃত্যশিল্পীর পরোক্ষ উল্লেখ আছে। যেসব শূদ্র কারিগরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা নিজস্ব 'শ্রেণী' বা পেশাদারি সংগঠন গঠন করে নিজেদের সুসংহত ও সংঘবদ্ধ করেন। এসব সংগঠনের নিজস্ব আইন-কানুন ছিল এবং তা রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করেছিল। লোকেরা অনেক সময় এ ধরনের শ্রেণীতে সুদের বিনিময়ে তাঁদের টাকা আমানত রাখতেন। শ্রেণী সেই টাকা তার ব্যবসায়ে খাটাত বা চড়া সুদে অন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ধার দিত। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে শ্রেণী অংশগ্রহণ করত। শ্রেণী গড়ে ওঠার ফলে শূদ্র কারিগরদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও আর্থিক সংগতি, দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃহস্পতি ও যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্রের ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকার অনুমোদন করেছেন। পণ্যাদির কেনাবেচা করে শূদ্র জীবিকা অর্জন করবেন, এ কথা মার্কণ্ডেয়-পুরাণেও বলা হয়েছে। তবে উচ্চতর বর্ণের তুলনায় শূদ্রের উপর করের বোঝা বেশিই ছিল। বৃহস্পতি বলেন, শূদ্র তাঁর লাভের এক-ষষ্ঠাংশ রাজাকে দেবেন, বৈশ্য দেবেন এক-নবমাংশ, ক্ষত্রিয় এক-দশমাংশ, এবং ব্রাহ্মণ এক-বিংশতি অংশ। শূদ্রদের অনেকেই সেনাবাহিনী, খেত-খামার, গোশালা, মালবহন, জিনিসপত্রের ফেরি করা ও আরও নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এসব কাজে বেতন ছিল। বেতন পূর্বেও ছিল কিন্তু এ সময় সম্ভবত তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেখানে মনুর বিধানে গোরুর দুধের মাত্র এক-দশমাংশ গোপালকের প্রাপ্য, সেখানে শান্তিপর্বে গোপালকের পাওনা এক-ষষ্ঠাংশে ধার্য হয়েছে। শান্তিপর্বে আরও বলা হয়েছে, ভৃত্য একশোটি গোরু তত্ত্বাবধান করলে দু'টি গোরু তাঁর প্রাপ্য হবে। নারদ বলেছেন, দু'শোটি গোরুর দায়িত্ব নিলে ভৃত্যের ফি-বছর একটি করে দুগ্ধবতী গোরু পাওনা হবে। তা ছাড়া প্রতি অষ্টম দিনে সকল গোরুর দুধ তাঁর প্রাপ্য হবে। যেসব শূদ্র খেত-খামারে ভাগচাষির কাজ করতেন তাঁদেরও পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থাপনার সুযোগ গ্রহণ করে বহু শূদ্র আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও শূদ্রের অধিকার প্রসারিত হয়। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, শূদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন তবে সে যজ্ঞে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হবে না। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের বক্তব্যও অনুরূপ। যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছেন, শূদ্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, ব্রত এবং নমঃ মন্ত্রের দ্বারা প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞ[১] সম্পাদন করতে পারবেন। শান্তিপর্বে শূদ্রের বেদ শ্রবণের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ভাগবত-পুরাণে বলা হয়েছে, বেদ নয়, মহাভারতই শূদ্র ও নারীদের পক্ষে প্রশস্ত। তবে এক্ষেত্রে অধ্যয়ন না শ্রবণের কথা বলা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ভবিষ্য-পুরাণে আছে, শূদ্র পুরাণ পাঠ করতে পারবেন না, কিন্তু পুরাণ শুনতে পারবেন। পঞ্চম বেদ যাকে বলে সেই নাট্যশাস্ত্রের উপর সকল বর্ণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার স্বয়ং এই অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। সাংখ্য ও যোগ, দর্শনের এ দু'টি শাখাও শূদ্ররা অনুশীলন করতে পারতেন। কর্ণবেধন ও চূড়াকরণ, এ দু'টি সংস্কার পালনের অধিকারও শূদ্রদের দেওয়া হয়েছে। গুপ্তপর্বে বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্রসাধনা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ দু'টি ধর্মীয় আন্দোলনে শূদ্র বর্ণ সম্পর্কে উদার মনোভাব ব্যক্ত

১. পঞ্চমহাযজ্ঞ বলতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পিতৃলোকের তর্পণ, হোম, পশু-পাখিকে অন্নাদি দান ও অতিথিসেবা বোঝায়।

Scanned with CamScanner

হয়েছে। বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ-নারায়ণ-বাসুদেবের প্রতি অচলা ভক্তি থাকলে শূদ্র ও নারীরাও মোক্ষ লাভ করতে পারেন। তন্ত্রে তো বর্ণভেদই অস্বীকৃত হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে লেখা তন্ত্রের বই জয়াখ্যসংহিতায় বলা হয়েছে, বর্ণনির্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তি তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা নিতে পারেন। বর্ণ সম্পর্কে বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্রসাধনার উদার দৃষ্টিভঙ্গি গুপ্তযুগে শূদ্রের ধর্মীয় অধিকার লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। এতদিন শাস্ত্রীয় বিধানে শূদ্রের দান ব্রাহ্মণাদি জাতির কাছে অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত হত। কিন্তু শূদ্রের আর্থিক সংগতি ও ধর্মীয় অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। শূদ্রের দান করার অধিকার শাস্ত্রের স্বীকৃতি পেল। মৎস্য-পুরাণে বলা হয়েছে, দানের মাধ্যমেই শূদ্রের সর্ব কামনা সিদ্ধ হতে পারে। অনুশাসনপর্বে উল্লেখ আছে, দানের অনুশীলনের দ্বারাই শূদ্রের স্বর্গলাভ বা পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন সম্ভব। শূদ্রের গৃহে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হত। পুরোহিতেরা শূদ্রের নিকট থেকে দান গ্রহণ করতেন।

বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস : একই বংশে পুরুষ পরম্পরায় একই বৃত্তির অনুসরণ ও সবর্ণ বিবাহ বর্ণব্যবস্থার দু'টি মূল স্তম্ভ। কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ ও নতুন বৃত্তি গ্রহণের বহু নিদর্শন এই পর্বে পাওয়া যাবে। গুপ্তরাজেরা সম্ভবত বর্ণে বৈশ্য ছিলেন অথচ তাঁরা রাজপদ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। অনুমান করা যায়, তাঁদের সৈন্যবাহিনীর অনেকেই বৈশ্য ছিলেন। ময়ূর-শর্মা বর্ণে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং কর্ণাটকে কদম্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ছিলেন ব্রাহ্মণ সাধু ইন্দ্রবিষ্ণুর প্রপৌত্র। তিনি গুপ্ত রাজাদের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের একখানি লেখে দু'জন ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। তাঁরা উচ্চ গাঙ্গেয় অববাহিকার কোনও এক শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এই পর্বে উৎকীর্ণ মন্দসোর লেখে উল্লেখ আছে, গুজরাতের লাট অঞ্চলের একদল রেশমশিল্পী মালবে এসে কালক্রমে সৈন্য, তিরন্দাজ, চারণকবি, জাদুকর ও জ্যোতিষীর জীবিকা অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অনুশাসন যাই হোক না কেন, গুপ্তযুগে এক জাতির লোকদের অন্য জাতির বৃত্তি গ্রহণে সে রকম কোনও বাধা ছিল না।

তেমনি বিবাহাদিতেও অনেক সময় শাস্ত্রীয় নির্দেশ মানা হত না। বৈশ্য নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ হয়েছিল। রুদ্রসেন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে ব্রাহ্মণ অগ্নিমিত্রের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজকন্যা মালবিকার বিবাহের উল্লেখ আছে। গুপ্তবংশের রাজকুমারদের সঙ্গে কদম্ববংশের ব্রাহ্মণরাজ কাকুৎস্থবর্মার কন্যাদের বিবাহ হয়েছিল। সমকালীন নাটক মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ চারুদত্ত গণিকা বসন্তসেনাকে বিবাহ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ শর্বলিক গণিকার সহচরী মদনিকার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্র পত্নীর পুত্রের ব্রাহ্মণ পিতার সম্পত্তিতে অধিকার অনুমোদন করেছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান যে কখনও কখনও শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ করতেন, তা যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে স্পষ্ট।

শাস্ত্রকারেরা অবশ্য বিভিন্ন বর্ণের লোকদের গ্রাম বা শহরে একত্রে বসবাস অনুমোদন করেননি, এক এক বর্ণের জন্য এক একটি অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বরাহমিহির বলেন, ব্রাহ্মণ বাস করবেন শহর বা গ্রামের উত্তরাঞ্চলে, ক্ষত্রিয় পূর্বাঞ্চলে, বৈশ্য দক্ষিণাংশে এবং শূদ্র পশ্চিম প্রান্তে। কোন্ বর্ণের লোকদের ক'খানি করে ঘর থাকবে, বৃহৎসংহিতায় তারও নির্দেশ আছে। তবে সাধারণত গৃহস্বামীর আর্থিক সংগতির উপর বাড়ির ঘরের সংখ্যা নির্ভর করে। সে ক্ষেত্রে বৃহৎসংহিতার বিধান কতদূর বাস্তবানুগ ছিল তা অনুমানের বিষয়।

Scanned with CamScanner

সংকর জাতি : সমকালীন ধর্মশাস্ত্র ও বৃহৎসংহিতায় এমন অনেক জাতির উল্লেখ আছে যাদের সংকর জাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বৃহৎসংহিতায় ডোম্ব, নিষাদ, পারাশব, শ্বপচ এবং উগ্র নামে এরূপ পাঁচটি সংকর জাতির কথা বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির সংকর জাতির তালিকাটি দীর্ঘতর। এই তালিকায় চণ্ডাল, শ্বপদ, ক্ষত্রি, সূত, বৈদেহিক, মাগধ, আয়োগব, অম্বষ্ঠ, নিষাদ, মাহিষ্যক, বেণ, শৌণ্ডিক, রথকার, মূর্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি জাতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জাতিগুলির উৎপত্তি ও বৃত্তি সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বিশদ আলোচনা আছে।

ডোম্বরা বর্তমানে ডোম নামে পরিচিত। শ্মশান-ঘাটের তদারকি, গান-বাজনা, ঝুড়ি ও অনুরূপ জিনিসপত্র বিক্রি তাঁদের পেশা ছিল। তাঁরা যমের পূজা করতেন। নিষাদরা ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্র নারীর সন্তান। তাঁরা কখনও ভিলদের, কখনওবা পারাশবদের সমগোত্রীয় বলে বর্ণিত হয়েছেন। শিকার ও লুণ্ঠন ছিল তাঁদের বৃত্তি। তাঁদের গায়ের রঙ কালো, আকৃতি খর্ব, নাক বোঁচা, চোয়াল কঠিন ও চুল তামাটে। শূদ্র স্বামী ও ব্রাহ্মণ কন্যার সন্তান পারাশব। উগ্র পিতা ও ক্ষত্রি মাতা বা ক্ষত্রি পিতা ও উগ্র মাতা বা চণ্ডাল পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার বংশজ শ্বপচ। তাঁরা শ্বপক নামেও পরিচিত। তাঁরা অন্ত্যজ, চণ্ডালদের সমগোত্রীয়। গ্রাম বা শহরের বাইরেই তাঁদের বাস। আবর্জনা পরিষ্কার করা তাঁদের পেশা। ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্র মাতা হতে উগ্র জাতির উৎপত্তি। কৃষি, পশুপালন ও শিকার তাঁদের জীবিকা। সংকর জাতির সর্বনিম্ন স্তরে চণ্ডালদের অবস্থান। শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সংকর তাঁরা। তাঁরা অস্পৃশ্য। তাঁদের স্পর্শ লাগলে ব্রাহ্মণকে স্নান করে পবিত্র হতে হবে, যাজ্ঞবল্ক্যের এই বিধান। তাঁদের বাস গ্রাম বা শহরের বাইরে। শ্মশানঘাটের কাজ, বেওয়ারিশ মৃতদেহ বহন ও দাহ, ঘাতকবৃত্তি, রাতের বেলা চোরধরা ইত্যাদি তাঁদের পেশা। রাতে তাঁদের গ্রাম বা শহরে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলা গ্রাম বা শহরে প্রবেশের সময় তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন দেহে ধারণ করতে হত। ফা শিয়েন বলেছেন, শহরে বা হাটে প্রবেশের সময় চণ্ডালরা লাঠি ঠুকে শব্দ করে অন্যদের তাঁদের আগমন-বার্তা জানিয়ে দিতেন যাতে পথচারীরা তাঁদের স্পর্শ এড়িয়ে চলেন। তিনি মাছ-ধরা, শিকার ও মাংস-বিক্রি চণ্ডালদের বৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ভারতীয় জাতিদের মধ্যে শুধু চণ্ডালরাই সুরা পান করেন ও পেঁয়াজ-রসুন খান। ভাগবত-পুরাণে বলা হয়েছে, বদমেজাজী চণ্ডালরা মেয়ে অপহরণ করেন। ক্ষত্রিদের পিতা শূদ্র, মা ক্ষত্রিয়। তাঁরা শিকারজীবী। সূতরা ক্ষত্রি পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর মিলন-জাত। রথচালনা তাঁদের মুখ্য পেশা। রাজাদের গুণকীর্তি আবৃত্তি করা, রথ, হাতি ও ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা তাঁদের জীবিকা বলে বায়ু-পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশ্য পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সংকর বৈদেহিক। অন্দরমহলে পাহারার কাজ, পশুপালন ও চর্মসামগ্রী বিক্রি তাঁদের পেশা। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভে মাগধদের জন্ম। অনেকের মতে তাঁদের পিতা শূদ্র, মা বৈশ্য। স্থলবাণিজ্য এবং চাটুকারিতা তাঁদের জীবিকা ছিল। শূদ্র পুরুষ ও বৈশ্য নারীর সন্তান আয়োগব। কাঠকাটা, তাঁত বোনা ও ধাতুর পাত্র তৈরি করা তাঁদের পেশা। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মা হতে অম্বষ্ঠদের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁদের প্রধান বৃত্তি চিকিৎসা ও কৃষি। মাহিষ্য বা মহিষ-করা ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্য নারীর সংকর। কৃষি, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বৃত্তি তাঁদের উপজীবিকা। বৈশ্য ও শূদ্র বা মাহিষ্য ও করণের সংকর রথকার। রথ নির্মাণ তাঁদের পেশা। বেণ বা বৈণরা বৈদেহিক ও অম্বষ্ঠ বা শূদ্র ও ক্ষত্রিয় নর-নারীর সংকর। শৌণ্ডিকরা ছিলেন মদ ব্যবসায়ী। সুবর্ণকারেরা সোনার গহনা তৈরি করতেন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি ও গুপ্তযুগের লেখমালায় কায়স্থদের উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদের উৎপীড়ক রাজপুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন। লেখমালায়

Scanned with CamScanner

লেখক হিসাবে তাঁদের পরিচিতি। বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর মিতাক্ষরা ভাষ্যে কায়স্থদের লেখক এবং গণকরূপে বর্ণনা করেছেন। গুপ্তযুগেই সম্ভবত এক বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী রূপে (জাতি রূপে নয়) কায়স্থদের উদ্ভব হয়েছিল। এই পর্বে মূর্ধাভিষিক্ত নামে আর একটি নতুন জাতির উৎপত্তি হয়। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরুষ ও ক্ষত্রিয় নারীর মিলনজাত সন্তান। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ-চর্চা তাঁদের পেশা ছিল।

সংকর জাতিগুলির তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে, বৈদেহিক, মাগধ প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি আদি আঞ্চলিক উপজাতি এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। কিরাত, চণ্ডাল, শ্বপচ, আয়োগব, ডোম্ব, উগ্র এবং স্বর্ণকারদের মতো বৃত্তিধারী জনগোষ্ঠীও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই তথাকথিত 'দাস' বা 'দস্যু' বর্ণের আদি উপজাতি। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংকর তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করে এসব আদি উপজাতিদের ভারতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বেশির ভাগ সংকর জাতি শূদ্রবর্ণে স্থান পেয়েছে। চণ্ডাল, মৃতপ, সূত্রধর, রজক, কর্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি কয়েকটি সংকর জাতি যে শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত তা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বহু পূর্বেই উল্লেখ করে গেছেন। তেমনি করণ, অম্বষ্ঠ, উদ্‌গ্র (সম্ভবত উগ্র), মাগধ, মাহিষ্য, ক্ষত্রি, সূত, বৈদেহক, রথকার এবং চণ্ডাল জাতি অমরকোষের শূদ্রবর্গে স্থান পেয়েছে।

বিদেশিদের ভারতীয়করণ : বিদেশিদের ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া এই পর্বেও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। গুপ্তযুগের পূর্বেই শক, যবন, পহ্লব, কুষাণ, আভীর প্রভৃতি বিদেশি জাতির লোকেরা ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা এ দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা-লিপি গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। তাছাড়া তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে শাস্ত্রকারেরা তাঁদের উপেক্ষা করতে পারেননি। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়ে, কখনওবা শূদ্র পরিচয় দিয়ে তাঁরা বিদেশিদের বর্ণকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় হূণ নামে এক বিদেশি জাতি ভারতে প্রবেশ করে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মহাভারতের সভাপর্ব, মৎস্য-পুরাণ ও রঘুবংশে হূণদের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিদেশিদের মতো হূণরাও ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। জৈনগ্রন্থ কুবলয়মালায় বলা হয়েছে, হূণরাজ তোরমাণ শেষজীবনে জৈনধর্ম গ্রহণ করে পাঞ্জাবের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে পব্বৈয়া গ্রামে বাস করতেন। রাজা যশোধর্মার মন্দসোর অভিলেখে বলা হয়েছে, হূণনায়ক মিহিরকুল শিবের ভক্ত ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় বৃষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। বৃষ শিবের প্রতীক। মুদ্রায় বৃষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করে মিহিরকুল শিবের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তাঁর মুদ্রায় সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। সন্দেহ নেই, রাজা-রাজড়াদের আদর্শ অনুসরণ করে হূণ গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরাও ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন। হূণরা পরবর্তী যুগে রাজপুতদের ছত্রিশটি বিশুদ্ধ শাখার একটি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

নারী-সমাজ : শিক্ষা ও নারী : জন্মলগ্ন থেকেই মেয়েদের অধিকারহীনতার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত। তাঁদের জাতকরণ, নামকরণ ও চূড়াকরণ অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হত না অথচ পুত্রদের ক্ষেত্রে বেদমন্ত্র আবশ্যিক ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য মেয়েদের উপনয়ন নিষিদ্ধ করেছেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র ছিল এই উপনয়ন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, মেয়েদের বিবাহই হল উপনয়ন, পতিগৃহে বাসই গুরু সান্নিধ্য। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়, নায়ক সংস্কৃতে কথা বলছেন কিন্তু নায়িকা প্রাকৃত ভাষায় তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। এতে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণই প্রতিফলিত হয়েছে। মহাভারত নারীদের পক্ষে প্রশস্ত বলে ভাগবত-পুরাণে অভিমত

Scanned with CamScanner